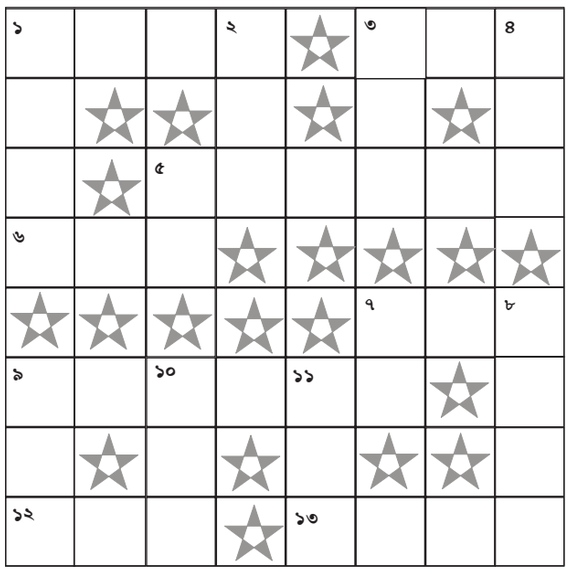

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
মঙ্গলবার ২৮ ফাল্গুন ১৪২৪ ■ ৩৮ বর্ষ ■ ২৯২ সংখ্যা

মুম্বইতে সমুদ্র কল্লোল

মুম্বই মহানগরে সোমবার আছড়ে পড়ে সমুদ্র কল্লোল। জনসমুদ্রে জোয়ার নামায় মহারাষ্ট্রের কৃষক জনতা। দৃশ্যতই মুম্বইতে ছিল লাল পতাকার ঢেউ। তবে এই লাল পতাকার কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে কুণ্ঠা দেখায়নি দক্ষিণপন্থী দল হিসেবে পরিচিত শিবসেনা থেকে শুরু করে প্রধানত মধ্যপন্থার দল কংগ্রেস, এনসিপি এবং নানা ঝোঁকের সমাজতন্ত্রী ও গণতন্ত্রীরা। একমাত্র বিজেপি ভিন্ন অন্যকোনো রাজনৈতিক দল এই অভিযানের প্রতি বিরূপ থাকার চেষ্টা করেনি। বিজেপিও অন্তত প্রকাশ্যে কৃষকদের বিরোধিতা করার সাহস দেখায়নি। মহারাষ্ট্রের কৃষক জনতা মহারাষ্ট্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে বিধানসভা ঘেরাও করে। আর রাজ্য সরকারের শরিকদল শিবসেনার সমর্থন পায় কৃষকরা। নাসিক থেকে সারা ভারত কৃষকসভার মহামিছিল লাল ঝান্ডা উড়িয়ে থানেতে ঢোকার মুখেই মহারাষ্ট্র মন্ত্রীসভার সদস্য তথা শিবসেনার অন্যতম নেতা একনাথ শিন্ডে তাঁর দলের পক্ষ থেকে কৃষক জনতাকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন। কৃষকরাও জানিয়েছে, এই মিছিল কেবল মহারাষ্ট্র সরকারকে বার্তা দিতে বিধানসভা ঘেরাও করছে না, মহামিছিল হুঁশিয়ারি বার্তা দিতে চায় কেন্দ্রীয় সরকারকেও। একইসঙ্গে দেশের সব অংশের মানুষের কাছে আবেদন জানাতে চায়, জোট বেঁধে তৈরি থাকার। সরকারি স্তোকবাক্য আর শূন্যগর্ভ প্রতিশ্রুতিতে না ভুলে সব রাজ্যে এবং জাতীয় স্তরে গড়ে তুলতে হবে সংগ্রামী ঐক্য। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় বৈঠকেও কৃষক প্রতিনিধিরা তাঁদের ওই মনোভাব ব্যক্ত করে। চাপের মুখে রাজ্য সরকার বকেয়া সমস্যা খতিয়ে দেখতে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের কমিটি গড়তে বাধ্য হয়েছে। আদিবাসীদের বনভূমি বণ্টন নিশ্চিত করবে ওই কমিটি।

বস্তুতই মহারাষ্ট্র স্তব্ধ করে দিয়েছিল কৃষক জনতা। রাজ্যের প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের কর্মীদের সমর্থন পাশে নিয়ে তারা জানিয়ে দিয়েছে, কৃষক সমাজের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ একটি জাতীয় দায়। সর্বভারতীয় বিরোধী জোটের অন্যতম প্রধান অনুঘটকের উপাদান নিয়ে তারা স্বমহিমায় উপস্থিত। রাজনৈতিক দলগুলির নেতারা তাকে কীভাবে দেশের গণতন্ত্র রক্ষা এবং বিকাশের পথে নিয়ে যেতে পারেন সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাঁদের। কারণ, বর্তমান শাসকদলের অধীনে সমাজের খেটে খাওয়া ও সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে নিম্নবর্গীয় মানুষ মোটেই নিরাপদে নেই। এমনকি স্বাধীনতা আন্দোলন এবং স্বাধীন ভারতের মূল্যবান অর্জন জাতীয় সংহতিও ক্রমশ অরক্ষিত হয়ে উঠছে। জাতপাত ও সাম্প্রদায়িকতায় বেদখল হচ্ছে জাতীয় ঐক্য। গণতন্ত্রের পতাকা যখন ধুলোয় লুণ্ঠিত হওয়ার উপক্রম হচ্ছে তখন তাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার দায়িত্ব নিতে হবে গণতন্ত্রকামী যাবতীয় রাজনৈতিক শক্তির জোটকেই।

মহারাষ্ট্র সংগ্রামের নগর। বালগঙ্গাধর তিলকের মতো শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠক পুরুষ থেকে শুরু করে গিরনি কামগড় ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতারা অতীতে বারবার সেটা প্রমাণ করে গিয়েছেন। নৌ–বিদ্রোহের সময় লাল ঝান্ডা, তেরঙা ঝান্ডা ও মুসলিম লিগের ঝান্ডা উড়িয়ে ১৯৪৬–এর সেই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ দিনগুলিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মেহনতি মানুষের অটুট ঐক্য দেখিয়েছিল শ্রমিক শ্রেণি। তারই এক নবসংস্করণ লক্ষ করা গেল নাসিক থেকে শুরু হওয়া ৬ মার্চের ত্রিশ হাজারি কৃষক মিছিলের চূড়ান্ত লগ্নে। জনজোয়ারে মিলেছে নানা স্রোত। মিছিলের কলেবর শুরুর চেয়ে দ্বিগুণ ছাপিয়ে গিয়েছে। মিছিল চায়, স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ মেনে ফসলের সহায়কমূল্য নির্ধারণ, কৃষিঋণ মকুব, আদিবাসীদের বনভূমির অধিকার, গরিব কৃষক ও খেতমজুরদের পেনশন বৃদ্ধি, গণবণ্টন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা। সর্বোপরি প্রতিশ্রুতির নামে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় ভাঁওতার অবসান। লক্ষণীয়, গত বছর থেকে মহারাষ্ট্রে এইসব দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। সরকার দাবি মেনে নিয়ে প্রতিশ্রুতিও দেয়। কিন্তু কার্যকরী হয়নি কিছুই। ঋণ মকুবের পরিমাণ মাত্র দেড় লক্ষ টাকা ঘোষিত হলেও তা মেলেনি। ২০১৭ সালের জুন থেকে কৃষকদের বধ্যভূমি মহারাষ্ট্রে আত্মঘাতীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭৫৩। অন্যদিকে মহারাষ্ট্রে আন্দোলনের প্রভাবে উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশ উত্তাল হলে সেখানেও প্রতিশ্রুতি মিলেছে। এমনকি ঋণ মকুবের নামে ভরতুকির অর্থবাবদ দু–পাঁচ টাকার চেক পাঠাবার হাস্যকর চিত্রও বৈদ্যুতিনমাধ্যমে উঠে এসেছে ওই সব রাজ্য থেকে। পক্ষান্তরে রাজস্থানে কৃষকসভার আন্দোলন খানিকটা হলেও জয়ী হয়েছে।

মনে রাখতে হবে কৃষিপ্রধান ভারতের রাজনীতির দিক নির্দেশক হয়ে ওঠার ক্ষমতা ধরে কৃষকজনতা। প্রয়োজন কর্মসূচিভিত্তিক সংগ্রাম ও রাজনৈতিক ঐক্য। লাল ঝান্ডা একটি ঐতিহাসিক প্রতীক। লাল ঝান্ডাওয়ালারা স্বাধিকার প্রমত্ততায় মগ্ন থেকে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যেতে পারে কোনো কোনো সময়ে। কিন্তু নবইতিহাস গড়ে মানুষের সংগ্রাম। তারই প্রতীক হয়ে উঠেছে মুম্বই মহানগরের সমুদ্র কল্লোল।

অমৃতধারা

যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোনো দেশ থাকে, যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে–যদি এমন কোনো স্থান থাকে, যেখানে পৃথিবীর সকল জীবকেই তাহার কর্মফল ভোগ করিবার জন্য আসিতে হইবে–যেখানে ঈশ্বরাভিমুখী জীবমাত্রকেই পরিণামে আসিতে হইবে–যেখানে মনুষ্যজাতির ভিতর সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমা, দয়া, পবিত্রতা, শান্তভাব প্রভৃতি সদ্গুণের বিকাশ হইয়াছে–যদি এমন কোনো দেশ থাকে, যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে, তবে নিশ্চয়ই বলিতে পারি, তা আমাদের মাতৃভূমি–এই ভারতবর্ষ। প্রত্যেক জাতিরই জীবনের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। সমগ্র মানবজাতির জীবনকে সর্বাঙ্গ–সম্পূর্ণ করিবার জন্য প্রত্যেক জাতিকেই একটি বিশেষ ব্রত পালন করিতে হয়। নিজ নিজ জীবনের উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিয়া প্রত্যেক জাতিকেই সেই সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়। রাজনীতিক বা সামরিক শ্রেষ্ঠতা কোনো কালেই আমাদের জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্য নহে–কখনও ছিলও না, কখনও হইবেও না। তবে আমাদের জাতীয় জীবনের অন্য উদ্দেশ্য আছে, তাহা এই– সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক শক্তি সংহত করিয়া যেন এক বিদ্যুদাধারে রক্ষণ করা এবং যখনই সুযোগ উপস্থিত হয়, তখনই এই সমষ্টিভূত শক্তির বন্যায় সমগ্র পৃথিবী প্লাবিত করা।

–স্বামী বিবেকানন্দ

শব্দরঙ্গ ■ ১৯৪৪

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি ঃ ১। ধনসম্পত্তি ও লোকজন, অর্থবল ও লোকবল ৩। ছোটো নাটক ৫। জোর করে দখল বা অধিকার, বেআইনি দখল ৬। অশ্বশালা, আস্তাবল ৭। গুলি ছোড়ার বড়ো অস্ত্র ৯। জায়গিরের মালিক, যে জায়গির ভোগ করে ১২। বিষ্ণু, নারায়ণ ১৩। রাজদরবার, রাজার সমীপ বা রাজসভা।

উপর–নীচ ঃ ১। পৃথিবী, মর্ত্যলোক ২। ভাগ্য, অদৃষ্ট ৩। ব্রহ্মার মানসপুত্র, দেবর্ষি ৪। বিস্ময়কর সাফল্য, অভাবনীয় কৃতিত্ব, অবাককাণ্ড ৫। বার্ধক্য, বার্ধক্যের শিথিল বা স্থবির অবস্থা ৭। পাকানো সুতো, ঘড়ি, তাবিজ, ঘুনসি ইত্যাদি বাঁধার সুতো ৮। আলংকারিক অর্থে উন্মেষ বা সূত্রপাত, নতুন ওঠা অঙ্কুর ৯। উগ্র টক লেবুবিশেষ, গোঁড়ালেবু ১০। পর্বতশ্রেষ্ঠ, পর্বতাধিপতি হিমালয় ১১। সংগীতের ছয়মাত্রার তাল, বিশেষ এক ধরনের গান।

সমাধান ■ ১৯৪৩

পাশাপাশি ঃ ১। অম্বিকা ৪। নায়ক ৫। ঢাক ৭। তিহাই ৮। কথান্তর ৯। কথকতা ১১। ইরাক ১৩। চারু ১৪। মাটাম ১৫। নহলা।

উপর–নীচ ঃ ১। অরাতি ২। কানাই ৩। বকবক ৬। কদর ৯। কড়চা ১০। তাড্যমান ১১। ইমন ১২। কপিলা।

গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত সিরিয়া মানবতার ধ্বংসস্তূপে পরিণত

সিরিয়া বিশ্বের দৃষ্টি কাড়ছে। গৃহযুদ্ধে ওই দেশ প্রকৃত অর্থে এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। কী হচ্ছে সিরিয়ায় ? দীর্ঘ প্রায় সাত বছর ধরে চলছে আক্রমণ প্রতি আক্রমণ। তার তত্ত্বতালাশ করেছেন **গ্রন্থিক দে**।

সিরিয়ায় আসলে কী ঘটছে ? প্রশ্নটা সহজ, কিন্তু উত্তরটা সহজ নয়। তার জন্য প্রয়োজন বিশদ বিশ্লেষণ। সিরিয়ায় প্রায় সাত বছর ধরে চলছে গৃহযুদ্ধ। আর তাতে সিরিয়া হয়ে উঠেছে এক হত্যাপুরী। সেখানে প্রতিনিয়ত মানবতার মৃত্যু প্রত্যক্ষ করতে হচ্ছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে গেলে প্রথমেই জেনে রাখা দরকার, সিরিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান। উত্তরে তুরস্ক, পূর্বে ইরাক, পশ্চিমে লেবানন ও ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণ–পশ্চিমে ইজরায়েল, দক্ষিণে জর্ডন। প্রথমে বিভিন্ন পক্ষের কয়েকটা নামের সঙ্গেও পরিচয় করে নেওয়া দরকার। যেমন –

১. **সরকার পক্ষ** ঃ সিরিয়ার দীর্ঘদিনের শাসক বাশার আল আসাদ। ক্ষমতায় বাথ পার্টি, ইরাকেও এই পার্টিই ক্ষমতায় ছিল সাদ্দাম হোসেনের আমলে। আসাদের সমর্থনে আছে রাশিয়া, ইরান ও চিনের মতো দেশ। তবে চিনের সমর্থন কূটনৈতিক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ।

২. **এফএসএ** ঃ পুরো নাম ফ্রি সিরিয়ান আর্মি। এদের লক্ষ্য আসাদকে সরিয়ে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করা। এদের নীতি নরমপন্থা এবং চরমপন্থার মধ্যবর্তী। এদের সমর্থনে রয়েছে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, সৌদি আরব, কাতার, জর্ডন, তুরস্ক।

৩. **চরমপন্থী বিদ্রোহী** ঃ এদের লক্ষ্য আসাদকে সরিয়ে 'সুন্নি'–নেশন প্রতিষ্ঠা। এরা আল–কায়দার শাখা সংস্থা, একে জাবাত–আল–নুসরা বা জাবাত–ফতেহ–আল–শাম বলা হয়। এদের সমর্থনে রয়েছে আরব দুনিয়া।

৪. **আইএসআইএল বা আইএসআইএস বা আইএস** ঃ এদের জন্ম ইরাকে, ২০১৪ সালে আল–নুসরা থেকে এরা পৃথক হয়।

৫. **কুর্দ** ঃ মূলত উত্তর সিরিয়া এদের দখলে। তুরস্কের দক্ষিণ এবং পূর্ব অংশেও এদের প্রভাব রয়েছে। এদের তৈরি সেনা সিরিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ফোর্সেস। এদের ইয়াকিনিনেন পারসিসিনা জেল (ওয়াইপিজি) এবং পারস্য কার্নিকন কুর্দিস্তান (পিকেকে) নামে দুটি শাখা আছে। পিকেকে মূলত ইরাক ও তুরস্কে সক্রিয়।

ঘটনার সূত্রপাত ২০–১০–১১–এর আরব স্প্রিং পরবর্তী সময়ে। আসাদ যথারীতি ক্ষমতায়। রুশ মদতপুষ্ট আসাদের কারণে মাত্র ১৩ শতাংশ শিয়া–আলাউইট সংখ্যালঘুরা মূল ক্ষমতা কুক্ষিগত করে এবং ৮৩ শতাংশ সুন্নি নাগরিকদের দীর্ঘদিন দমিয়ে রাখা হয়। ২০০৭ থেকে ২০১০–এর মধ্যবর্তী সময়ে খরা ও অন্যান্য কারণে দারিদ্র্য ভয়ংকর রূপ নেয়। একই সময়ে আরব স্প্রিংয়ের মতো ঘটনা সিরিয়ার মানুষকে বিদ্রোহ করার অনুপ্রেরণা দেয়। ২০১১–তে দেশজুড়ে শুরু হয় প্রতিবাদ। সিরীয় সেনার একটা অংশ (মূলত সুন্নিরা) সরকারের পক্ষ ত্যাগ করে ফ্রি সিরিয়ান আর্মি (এফএসএ) গঠন করে। এরপর ২০১২ সালে চরমপন্থীরা আল–কায়দার সহায়তায় গঠন করে জাবাত–আল–নুসরা, যা বর্তমানে জাবাত–ফতেহ–আল–শাম নামে পরিচিত। জন্মলগ্নেই এরা তুরস্কের সমর্থন পায় এবং দামাস্কাসে বিদ্রোহ চরম রূপ নেয়। আসাদের সেনা যখন দক্ষিণে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত, তখন উত্তরে 'কুর্দ'–রা স্বশাসনের দাবিতে 'রোজারা' ঘোষণা করে। আসাদ সরকারকে বিপাকে ফেলতে মার্কিন প্রভাবে তৈরি হয় আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সংস্থা 'ফ্রেন্ডস অফ সিরিয়া গ্রুপ'। এরা এফএসএ–কে সমর্থন করে। আবার 'শিয়া'–নেশন ইরান এগিয়ে আসে আসাদের সমর্থনে। আরব দুনিয়া এবং তুরস্ক সমর্থন করে চরমপন্থী সুন্নি জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোকে। হেজেবুল্লাহ নামক লেবানিজ শিয়া জঙ্গিরা আসাদকে সমর্থন করে। জর্ডন প্রথমে নিরপেক্ষ থাকলেও পরে আরব দুনিয়ার পক্ষে যোগ দেয়, কারণ জর্ডন–সিরিয়া সীমান্ত দিয়ে আরব থেকে আল–নুসরাকে অস্ত্র ও অর্থ পাঠানো সুবিধাজনক।

২০১৩ সালে আমেরিকা সরাসরি তাদের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ–র মাধ্যমে এফএসএ–কে যুদ্ধ প্রশিক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা করে, যদিও এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। এফএসএ–র সঙ্গে চরমপন্থীদেরও সংঘাত শুরু হয়। আমেরিকা আরব দুনিয়াকে নির্দেশ দেয় চরমপন্থীদের অর্থ জোগান বন্ধ করতে। অর্থাৎ ওদের তহবিল গঠনে সাহায্য না করতে। বদলে এফএসএ অধিক গুরুত্ব পায়। ২০১৩–র আগস্ট মাসে দামাস্কাসের ঘৌতা অঞ্চলে বিদ্রোহীদের ওপর নিষিদ্ধ রাসায়নিক অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ শানায় আসাদ সরকার, যার ফলে সাতশোর বেশি প্রাণ যায়। বিশ্বজুড়ে আসাদের পাশাপাশি রাশিয়াকেও চরম নিন্দার মুখে পড়তে হয়। রাশিয়া আসাদকে নির্দেশ দেয় অর্গানাইজেশন ফর দ্য প্রোহিবিশন অফ কেমিক্যাল উইপনস (ওপিসিডব্লিউ)–র কাছে তার সব রাসায়নিক অস্ত্র জমা দিতে। আসাদের সমস্ত রাসায়নিক অস্ত্র নিষ্ক্রিয় করার কারণে এই ওপিসিডব্লিউ সংস্থাটি ২০১৩ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়।

২০১৪ সালে আইএসআইএস আল–নুসরা থেকে পৃথক হয়। এরা একদিকে যেমন আসাদ সরকারের ওপর এবং শিয়াদের ওপর আক্রমণ করতে থাকে, অন্যদিকে আবার কুর্দ এবং এফএসএ–র ওপরেও আক্রমণ শানায়। এরা ইরাকের মসুল, ফালুজ্জার পাশাপাশি সিরিয়ার রাকা শহরেও শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপন করে।

২০১৫–তে তুরস্ক সরাসরি সিরিয়া এবং ইরাকের কুর্দদের ওপর বোমাবর্ষণ শুরু করে। এসময় রোমান স্থাপত্যের নিদর্শন পালমিরা শহর নিজেদের দখলে নিয়ে নেয় আইএসআইএস এবং একাধিক ওয়ার্ল্ড–হেরিটেজ সাইট ধ্বংস করে। সেপ্টেম্বরে রাশিয়া তার সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে আইএসআইএস, আল–নুসার এবং এফএসএ–কে ধ্বংস করতে। আসাদের সহযোগিতা করতে সিরিয়ায় প্রবেশ করে কয়েক হাজার কমিউনিস্ট মার্সিনারীর গেরিলা দল।

২০১৬ থেকেই আইএসআইএস তার জমি হারাতে থাকে। অপেক্ষাকৃত গ্রামীণ অঞ্চলে সরে যায় তারা। ওই বছরের ফেব্রুয়ারি এবং সেপ্টেম্বরে দুবার আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়, কিন্তু দুবারই তা ব্যর্থ হয়। চলতে থাকে যুদ্ধ, জ্বলতে থাকে সিরিয়া।

সিরিয়ায় যে অংশটি আসাদ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন তা সিরিয়ার সবচেয়ে উর্বর এবং উন্নত অঞ্চল। এখানে রাশিয়ার একটি নাভাল মিলিটারি বেস আছে। সরকার বিরোধী এফএসএ–র নিয়ন্ত্রণে রয়েছে দেশের কিছু অংশ। চরমপন্থী আল–নুসরা, কুর্দ এবং আইএসআইএসের নিয়ন্ত্রণেও রয়েছে কিছু অংশ। রাষ্ট্রসঙ্ঘ সিরিয়ায় শান্তি ফেরাতে প্রয়াস চালাচ্ছে। ২০১২ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত এই প্রয়াসে তিনবার জেনেভা সম্মেলন করা হলেও তা ব্যর্থ হয়। ২০১৫–র অক্টোবরে ভিয়েনা প্রোসেসও মার্কিন এবং রুশ সমঝোতা স্থাপনে সফল হয়নি। যথারীতি শিয়া–আলাউইটস–ক্রিশ্চান–ড্রুজদের ওপর চলতে থাকে সুন্নি আক্রমণ, আবার শহরাঞ্চলে সুন্নিদের ওপর চলতে থাকে শিয়া আক্রমণ, নেপথ্যে থেকে যায় বিশ্বের দুই সুপার পাওয়ার। ধ্বংস হয় দেশের পরিকাঠামো, সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ। বাড়তে থাকে নিরক্ষরতা, ফিরে আসে পোলিয়োর মতো রোগ। মানুষের গড় আয়ু ৭৫ থেকে ৫০–এ নেমে যায়। গোটা ইউরোপ জর্জরিত হয় উদ্‌বাস্তু সমস্যায়। পঁচাত্তরেরও বেশি বৈরী গোষ্ঠী নিয়মিত নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ জারি রাখে। বোমাবর্ষণ, রাসায়নিক বিস্ফোরকের ব্যবহার, আইএসআইএস–এর গণহত্যা ইত্যাদির পরিণতিতে সিরিয়ার মতো ছোটো দেশে এই অবধি প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে, জখম প্রায় ২০ লক্ষ। এমন ভয়াবহতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আর কোথাও সম্ভবত দেখা যায়নি। তাই সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মযুদ্ধ থাকলেও এখন একে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বলতেও দ্বিধা নেই।

> বৈরী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে যুদ্ধ, গণহত্যা ইত্যাদির পরিণতিতে সিরিয়ার মতো ছোটো দেশে এই অবধি প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে, জখম প্রায় ২০ লক্ষ। এমন ভয়াবহতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আর কোথাও সম্ভবত দেখা যায়নি।

জনমত

সরকারি বিদ্যালয়ে কেন আজ শিক্ষার্থীর আকাল ?

পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা ভারতে সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কমছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার পরেই কলকাতার ৭৫টি সরকারি হাইস্কুল বন্ধ হবে শিক্ষার্থীর অভাবে। অন্যদিকে ভিড় বাড়ছে বেসরকারি বিদ্যালয়ে। কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে ইংরেজি শিখতেই ভিড় বাড়ছে বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম বিদ্যালয়ে। তাই সরকারি প্রাথমিক এবং উচ্চবিদ্যালয়গুলিকে ইংরেজিমাধ্যম বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার প্রয়াস চলছে।

কিন্তু সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর আকাল কি কেবল এই জন্যেই ? মোটেও না। সার্বিক পরিকাঠামোর অভাবই বরং শিক্ষার্থী আকালের জন্য দায়ী। সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষক–শিক্ষিকার আকাল সর্বজনবিদিত। পশ্চিমবঙ্গের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পাঁচটি শ্রেণি আছে। তাই ন্যূনতম পাঁচজন শিক্ষক–শিক্ষিকা দরকার প্রতিটি বিদ্যালয়ে। তারপর শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষক বাড়বে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, বেশিরভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক–শিক্ষিকার সংখ্যা ২–৩ জন। ফলে পাঠদান যে ব্যাহত হবেই সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বহু বিদ্যালয়েই একজন শিক্ষককেই তিনটি ক্লাসে একসঙ্গে পাঠদান করতে হয়। ফলে কোনো ক্লাসকেই মনমতো পাঠদান করা হয় না।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাকর্মী নেই। ফলে মিড–ডে মিলের চাল বের করা, হিসাব, মেসেজ পাঠানো আর বিডিও অফিস, এসআই অফিস করতে করতেই ব্যস্ত থাকতে হয় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে। আবার বেশিরভাগ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দিয়েই চলছে।

এছাড়াও সীমানাপ্রাচীর, বিশুদ্ধ পানীয় জল, রানিং ওয়াটার সিস্টেম, নিরাপত্তা সহ নানা দিকের ঘাটতির ফলেই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত সচেতন অভিভাবককুল। আর্থিক অনটন হলেও গরিব, মধ্যবিত্ত অভিভাবকরা বেসরকারি চড়াদামের বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা কিনে খাওয়াচ্ছেন সন্তানদের। সরকারি বিদ্যালয়ে মিড–ডে মিল হলেও আসলে যে পরিকাঠামো পুষ্টির অভাব।

উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতেও হাহাকার করছে শিক্ষকের অভাব। নিয়োগের বোল উঠছে আবার থেমে যাচ্ছে। শিক্ষা কিনতে হচ্ছে পাড়ার টিউশন সেন্টার থেকেই। বিদ্যালয়ে শিক্ষক–শিক্ষিকার অভাব সেটা অভিভাবকের চিন্তার বিষয় হয়ে উঠছে না। মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিকে পাঠরত শিক্ষার্থীর অভিভাবক চিন্তিত একটা বিষয়ে–অমুক শিক্ষকের টিউশন সেন্টারটা বন্ধ হবে না তো ? রেজাল্ট আজকাল নির্ভর করে প্রাইভেট টিউশনের উপর। বিদ্যালয় হয়ে উঠছে সার্টিফিকেট নেওয়ার মাধ্যম।

পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা ভারতের অভিভাবককুল যেভাবে আজ বেসরকারি বিদ্যালয়মুখী তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এতে সুবিধা পেয়ে যাচ্ছে গণতান্ত্রিক সরকারগুলিই, যাদের অন্যতম প্রধান কাজ বিনামূল্যে সবার জন্য পরিপূর্ণ শিক্ষার সুব্যবস্থা করা। কখনোই শিক্ষার বেসরকারিকরণকে উৎসাহিত করা নয়। প্রতিটি বিদ্যালয়কে সরকার চাইলেই ঝাঁ চকচকে করতে পারে। পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে পারে। কিন্তু এই বিষয়টা উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। কিন্তু এখনকার মানুষ একবেলা কম খাবে তবু শিক্ষা নেবে। এই সুযোগে বেসরকারি বিদ্যালয়ের মালিকরা ফুলে উঠছে। আর সরকারগুলিও নিজেদের দায়িত্ব কর্তব্য সুচারুভাবে ঝেড়ে ফেলতে সমর্থ হচ্ছে। স্কুলগুলি বন্ধ হলেই সরকারের প্রচুর টাকা বেঁচে যাবে।

তাই সবশেষে এটা পরিষ্কার যে, সরকারগুলির উদাসীনতায়, সরকারি স্কুলের পরিকাঠামো সহ শিক্ষক–শিক্ষিকার অভাবেই সরকারি প্রাথমিক এবং উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর আকাল দেখা দিচ্ছে। এক্ষেত্রে অভিভাবকদেরও সচেতন হতে হবে। বিদ্যালয় পরিকাঠামো উন্নয়ন, পর্যাপ্ত শিক্ষক–শিক্ষিকা নিয়োগও যে এই দেশের একটি জোরালো রাজনৈতিক ইশ্যু তা জনগণ ভাবছে না। তাই সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী আনতে সরকারগুলিকে পরিকাঠামো উন্নয়নেই জোর দিতে হবে।

আব্দুল জলিল সরকার, শিক্ষক
বক্সিগঞ্জ, হলদিবাড়ি।

এনজেপি স্টেশনে মশার উৎপাতে যাত্রীরা নাজেহাল

গত ৪ মার্চ রাত আড়াইটায় ব্যস্ততম স্টেশন নিউ জলপাইগুড়িতে তিস্তা–তোর্ষা দাঁড়াতেই ছেঁকে ধরল অসংখ্য মশা। পরিত্রাণ পেতে দ্রুত হাঁটা শুরু করলাম। দেখলাম মশার কামড় থেকে বাঁচতে সহযাত্রীরাও তড়িৎগতিতে স্টেশনের বাইরে যাবার চেষ্টা করছেন। রাত আড়াইটাতেও স্টেশনের বাইরে অপেক্ষমান যাত্রীদের হাতে রুমাল, তোয়ালে, গামছা ইত্যাদি। সবাই মশা তাড়াচ্ছেন। মশা তাড়ানো মোটেই সহজ নয়। রুমালের হাওয়াতে কি আর মশা যায় ? মশার কামড়ে হাত–পায়ের চামড়া ফেটে যাওয়ার উপক্রম।

এনজেপিতে বিকেল ৪টা নাগাদ ফিরে এলাম। জনআহারেও সেই একই মশার স্রোত। জনআহারের দেয়ালে রাখা ফ্লাই ক্যাচার অচল হয়ে পড়ে আছে। বেসিনেও মশা ! সবচেয়ে বড়ো কথা, এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম ২৪ ঘণ্টা ধোয়ামোছা হলেও, মশার কামড়ে যাত্রীরা একইরকমভাবে রক্তাক্ত হচ্ছেন। মশা মারার যে দামি দামি কীটনাশক ভারী ভারী আধুনিক মেশিন মারফত স্প্রে করা হচ্ছে সেই কীটনাশকগুলো কি ভেজাল কীটনাশক ? মশা সেখানে মরে না কেন ?

আশঙ্কা, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়ার সুতিকাগার হয়ে গিয়েছে জনভারে বিপর্যস্ত এনজেপি স্টেশন। যেখানে সারা ভারতবর্ষ থেকে তো বটেই, বিদেশি পর্যটকরাও আসেন। এনজেপি স্টেশনের মশার কামড়ে এন্‌সেফেলাইটিস সহ অন্যান্য রোগের সংক্রমণ নিয়ে বিদেশিরা ফিরে গেলে, রাজ্য বা দেশ কারুরই গৌরব বাড়বে না ! বিগত বারো–পনেরো বছরে এইসব স্টেশনে এসি মেশিন, গ্লো–সাইন বোর্ড, ওয়াইফাই সংযোগ, রেল কর্মচারীদের ইডনিফর্ম, আধুনিক অ্যানাউন্সমেন্ট ব্যবস্থা, ফুড প্লাজা, বেস কিচেন প্রভৃতি কসমেটিক পরিবর্তন এনে একটা কর্পোরেট লুক আনবার চেষ্টা করা হয়েছে। যে কারণে বিপুল অর্থ রেল কোশাগার থেকে খরচ করা হচ্ছে। কিন্তু তিনটি ফ্রন্টে রেল কর্তৃপক্ষ গোল্লা খেয়ে বসে আছে। আইআরসিটিসি–র খাদ্যখাবার অত্যন্ত নীচুমানের, স্টেশনের জনআহার বা ফুডপ্লাজার ভিতরের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন নয়, স্টেশনগুলোতে আধুনিক গ্লো–সাইনবোর্ড বসলেও রান্নাঘরে বা বেসিনের ধারে শৌচাগার পরিষ্কারের ব্রাস ঝুলতে দেখা যায়। শিলিগুড়ি কর্পোরেশনেরও এই মশার বংশবিস্তার রোধে এখনই চিন্তা করা দরকার।

অধ্যাপক শান্তনু বসু
চাঁচল কলেজ, মালদা।

বারবিশায় কলেজ চাই

নবগঠিত আলিপুরদুয়ার জেলার একটি প্রান্তিক জনপদ তথা বাণিজ্যকেন্দ্র বারবিশা। প্রায় তিরিশ হাজার জনগণের বাস এখানে। একটি ক্রমবর্ধমান জনপদ হিসাবে বারবিশাবাসীর অনেকদিনের দাবি বারবিশায় একটি কলেজ স্থাপিত হোক। পার্শ্ববর্তী কামাখ্যাগুড়িতে একটি কলেজ থাকলেও এই একটিমাত্র কলেজের পক্ষে এই বিশাল এলাকার ছাত্রছাত্রীর চাপ সামলানো সম্ভব হয় না। বারবিশা এবং তার পার্শ্ববর্তী ফলিমারি, রামপুর, জোড়াই, মাঝেরডাবরি, ভলকা, কুমারগ্রাম, দলাদলি এমনকি নিম্ন অসমের কিছু এলাকার ক্রমবর্ধমান বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর চাপ সামলাতে এবং এই সমস্ত গ্রামীণ এলাকার ছাত্রছাত্রীদের কাছে উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করে তুলতে অবিলম্বে বারবিশায় একটি কলেজ গড়ে তোলা দরকার। কিন্তু বারবিশাবাসীর দীর্ঘদিনের এই দাবি পূরণে সরকারের তরফে এখনও সেরকম কোনো সবুজ সংকেত মেলেনি।

সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার জেলায় একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। আলিপুরদুয়ারবাসীর কাছে এটা সত্যিই খুশির খবর। তাই আলিপুরদুয়ার জেলার সামগ্রিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আলিপুরদুয়ার শহরের পাশাপাশি জেলার প্রান্তিক এলাকাগুলিরও উন্নয়ন প্রয়োজন। তাই এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের এই দাবিকে মান্যতা দিয়ে অবিলম্বে বারবিশায় একটি কলেজ স্থাপনে রাজ্য সরকারকে উদ্যোগী হতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিকাশ সাহা
বটতলা, বারবিশা।

সবুজায়নের জোয়ারে ভাসতে নিজে সবুজ হোন

'গাছ লাগাই প্রাণ বাঁচাই'–এই কথাটির বাস্তবতা রয়েছে। আমরা যদিও অক্সিজেন থেকে খাদ্য সবকিছুই পেয়ে থাকি উদ্ভিদের কাছ থেকেই, তবুও সবুজের প্রহরী হয়ে সবুজকে টিকিয়ে রাখতে অবুঝ হই বারেবারে। কেন এই অবিচার উদ্ভিদের প্রতি ? বিজ্ঞানই প্রমাণ করেছে প্রত্যেক উদ্ভিদই উত্তেজনায় সাড়া দেয়, তবে মানুষ কেন বৃক্ষ নিধনের মতো ঘৃণ্য অপকর্মের উত্তেজনায় সাড়া দেয় না ?

আইন অনুযায়ী একটি গাছ কেটে ফেললে তিনটি গাছ লাগানো উচিত, সেক্ষেত্রে আগে থেকে ঠিক করা উচিত যে গাছ লাগানো হবে। তার এলাকা নির্দিষ্ট করা, তারপর সরকারি নির্দেশ দেওয়া সেই সময়ের মধ্যে সেই গাছ লাগাতে উদ্যত হওয়া, তা তো আদতে চোখে পড়ছে না ! উপরন্তু কোনো কোনো স্থানে কাটা গাছ পড়ে থাকছে রাস্তার ধারে, রাত জেগে তার হিসেব রাখে কে ? গাছগুলি তো রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীদের দ্বারা চুরিও হয়ে যেতে পারে।

কবিগুরুর একটি উক্তি একটু নজরে আনি। তিনি বলেছিলেন বৃক্ষ বন্দনায়–অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান, প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ আদিপ্রাণ। সবুজায়নের জোয়ারে ভাসতে গেলে নিজেকে আগে সবুজ হতে হবে, নিজের মনকে সবুজ করতে হবে, তবেই সবুজ কাছে ডাকবে আমাদেরকে। মানুষের চাই মেঘ, বৃষ্টি, সিক্ততা, ফসল, কৃষিকাজ যা ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকা অসম্ভব। গাছের ছায়ায় মানুষ পায় জীবনের ছন্দ। কাজেই গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান, প্রাণ বাঁচলেই চলা আসান।

শুভজিৎ বোস, শিক্ষক
নকশালবাড়ি, দার্জিলিং।

সচেতনতা দরকার

সকালে বাঁশি বাজিয়ে ময়লা নিয়ে যাওয়ার পর বহু বাড়ি তাদের প্রাত্যহিক বর্জ্য রাস্তায় ফেলছে এবং শহর নোংরা করছে। এ ধরনের নাগরিক অসচেতনতা কাম্য নয়। সম্প্রতি এই বিষয়ে চিঠি পড়েছি। কিন্তু সংশোধন হতে দেখছি না।

মুনমুন দাস
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

ড্রেনের বেহাল অবস্থা

কোচবিহার পুর এলাকার নবনির্মিত অধিকাংশ পাকা ড্রেন বর্ষা আসবার আগেই জলপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। সামনেই বর্ষা আসছে, তখন যে কী অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমেয়। আমি বিশেষ করে ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বেহাল ড্রেনগুলোর অবস্থার কথা বলছি।

মাঝে মধ্যে দেখা যায় দুই একজন লেবার এই ড্রেনগুলি থেকে কিছু প্লাস্টিক বা সাধারণ আবর্জনা তোলে। অথচ এই ড্রেনগুলিতে এক থেকে দেড় ফুট বালি, কাদা জমে আছে। সেগুলির কোনো ব্যবস্থাই হয় না।

এই বিষয়গুলিতে পুরসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু সবই বৃথা। তাঁদের কাছে অনুরোধ, দ্রুত ড্রেন পরিষ্কারে পদক্ষেপ নিন।

নগেন্দ্রনাথ সেন
ধর্মতলা, কোচবিহার।